

A Puja Present

অতিথি

১ম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৩৭ | ১ম সংখ্যা

অতিথি

সন্ধ্যার অতিথিরে লহ বরি',
সে যা এনেছে দিবে দ্বারে রিক্ত করি'।
চরণে তার বাজে স্বপন-ধ্বনি,
থেমে যায় গ্রহতারা, কাঁপে অবনী,
নয়ন-অতলে তার বরিষার বারিধার
শরত-সুনীলে যেন রেখেছে ধরি' !

তার আধ আঁখি ঢুলে যেন ভরা তিমিরে,
আধ আঁখি জ্বলে' উঠে আকাশ ঘিরে',
তরুশিরে সোণা ঢালা, তরুতলে ছায়া মেলা
তার কপোলে কি মায়াজাল রচিছে মরি।

সারা দিন মাঠে মাঠে যাহা সঞ্চয়,
বন হ'তে আনিয়াছে যাহা মন লয়,
বনফুলে ভরা ঝুলি, হয়ত লেগেছে ধূলি,
সরস পাপ্‌ড়ীগুলি গিয়াছে ঝরি'।

সে আসিয়াছে নব বেশে, বিদেশী সেজে,
জগতের হাসা কাঁদা গড়েছে নিজে,
শত মনে মন ঢালি' লয়েছে জীবন খালি,
রূপেরে এঁকেছে কত গোপনে ভরি'।

ফুলের বরণে যার পরশ মেশে,
সে ঘুরিয়া এসেছে সেই তারার দেশে,
শ্রান্ত চরণে তার যাওয়া আসা বারবার
জীবনের—লেখা আছে মৃত্যু হরি'।

সে যে আসিয়াছে তব দ্বার পানে,
আকাশ বাতাসের নব আহ্বানে,
ভাঙা বীণা হাতে তার, আননে ব্যথার ভার—
খুলিয়া হৃদয় লহ সুরেতে ভরি'।

শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়

উপমা *

—শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার রায়—

'ক্লোকিন্—শিউ'এর অবতরণিকায় 'সুরায়ুকি' লিখিয়াছেন, বর্তমানে প্রেম মনুষ্য-হৃদয় প্রলুব্ধ করিয়া অতিরিক্ত অলঙ্কারারানুরাগী করিয়া তুলিতেছে। তাই, অনুভূতির গভীরতা হারাইয়া কবিতা লঘু হইয়া উঠিতেছে।'.........দ্বিজেন্দ্রলাল 'কালিদাস ও ভবভূতি'-প্রসঙ্গে একজায়গায় বলিয়াছেন, '.........যেন উপমা একটা দিতেই হইবে।......কালিদাসের হইয়া দাঁড়াইয়াছে one for sense and one for simile'. ......আর চিত্তরঞ্জন 'কাব্যের কথা'য় স্পষ্টই জানাইয়াছেন, '......যেখানে ভাবের দৈন্য, সেখানেই উপমার প্রাচুর্য্য।......আজকালকার দিনে, "এই হিয়া দগ্‌দগি পরাণ পোড়নি কি দিলে হইবে ভাল—" এই ভাবটী প্রকাশ করিতে হইলে নানারকম উপমার আবশ্যক হয়।...আজকাল আমরা সব খেলোয়াড়।...একটী ভাব কোনরকমে জোগাড় হইলেই তাহাতে ভাষার রং মাখাইতে বসি এবং সেই রঙ্গিন জিনিষটাকে লইয়া, বলখেলার মত তাহাকে আছড়াইয়া আছড়াইয়া খেলিতে থাকি। কবির হৃদয় হইতে কোন ভাবই সহজে, সরলভাবে পাঠকের মনে আসে না। কবি যেন তাহাকে তাঁহার মন হইতে নামাইয়া মাঠে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে খেলা করেন, আর সেই অবসরে পাঠকেরা একটু একটু দেখিয়া লয়, আর কবির ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে।' ...এইখানে আশা করি, অভিযোগের চরম; আর বেশীদূর গড়াইবার কোনো দরকার নাই। কিন্তু, তবু দেখা যায়, দোষারোপের মত বাড়াবাড়ি, ভাল কাব্যে উপমারও তত প্রাচুর্য। গেটের শেষের দিকের কবিতায় আমরা simile'র বিরলতা দেখিলেও metaphor'এর,—simile'রই রূপান্তর—কোন অভাব দেখি না।

২

সেদিন কোন জাপানীগ্রন্থে একটী গল্প পড়িলাম। গল্পটী এই: কবি 'রিকিউ' নিমন্ত্রিতদের জন্য পুত্র 'শোন্'কে তাঁহার উদ্যানখানি পরিষ্কার করিতে বলিলেন। পুত্র তাহার অর্থ ঠিকমত ধরিতে না পারিয়া উদ্যানের আবর্জনা দুই-তিনবার সরাইয়া ফেলায় 'রিকিউ' ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 'আবর্জনা সরানো আর উদ্যান-পরিষ্কার একজিনিষ নয়।' তাহার পর নিজহাতে মেপল্-তরুর পাতা ঝরাইয়া রেশমী কাপড় বিছাইয়া দিলেন।

কাব্যের সম্বন্ধেও এই কথাটাই খাটে। আবর্জনা-হীন ভাবের প্রকাশে শুধু কাব্য হয় না। ভাষার অলঙ্কার তাহার সৌন্দর্যের অঙ্গ। এখানেও না হয়, সেই অলঙ্কারের প্রাচীন কথাটা রঙ্ ফিরাইয়া, ঘুরাইয়া বলা হইল।

কিন্তু উপমার ইহা অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর ও মহত্তর কারণ, উদ্দেশ্য আছে। প্রথমেই না হয়, উপমার জন্ম-কথা,—যেটুকু আমার মনে হয়—লইয়া আলোচনা করি।

মানুষ চিরদিনই তাহার বাহিরের বিশ্বের মাঝে আপনার সাদৃশ্য চাহিয়া বসে: 'Alastor'-এর তরুণ এই সাদৃশ্য-অনুসন্ধানেই নির্জন নদী বাহিয়া, গহন অরণ্য পার হইয়া শেষে কাশ্মীরের গুহায় আসিয়াছিলেন।

আমাদের দৈনন্দিন, সাধারণ, সামাজিক জীবনেও ঠিক এই কথা। আমাদের ভুল, ত্রুটি,—এমন কি গুণ-

* আমার উপমার উদাহরণে যে-গুলি আনিয়াছি, সংস্কৃত বা ইংরাজী অলঙ্কার-শাস্ত্রের মাপ-কাঠীতে তাহাদের অনেকগুলিই হয়ত, উপমা নয়। যেমন, 'যাঁহা যাঁহা পদ-যুগ ধরই। তাঁহা তাঁহা সরোরুহ ভরই॥'......যেখানেই একটী রূপ বা চিন্তা আর একটী বা অনেকগুলি রূপের সংযোগে প্রকাশে আপনাকে সফল করিতে চায়, তাহাদেরই উপমার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি।

গুলিও অপরের মধ্যে দেখিলে যেন অনেকখানি হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচি।

পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও আমরা এই কথাটা নির্ভয়ে বলিতে পারি। আমাদের মনের যে-দিক্‌টা চিরদিনই নূতনকে শ্রদ্ধা, প্রীতি, আগ্রহের চোখে দেখে, যে-দিকটা কোনো কিছু নূতন, অভাবনীয়ের মধ্যে তৃপ্তি, স্ফূর্তি আনন্দ পাইয়া থাকে, যে দিকটা আহারে, পরিচ্ছদে পড়াশুনায়, চাল-চলনে নূতনের প্রয়াসী, সে দিকটাও একা, নিজের মধ্যে কেমন সঙ্কোচ অনুভব করে। অপরের মধ্যে সাদৃশ্যের ভিতর দিয়া আপনার-পরিচয়ে তাহার কেমন এক সাহস, কেমন এক অনুপ্রেরণা।

আমাদের কথা-বার্তার বেলায়ও ঐ কথা। কথা-গুলিকে শুধু ছাড়িয়া দিতে কেমন-যেন বাধো-বাধো ঠেকে ; কেমন যেন লজ্জা অনুভব করি। তাই আমরা মেঘকে ডানা মেলিতে, ঢেউকে খেলিতে, বাতাসকে নাচিতে দেখি।

আমাদের অন্তরের ভাবগুলিও বাহিরের ঘটনাবলীর মধ্যে তাহাদের সাদৃশ্য দেখিয়া শক্তি সঞ্চার করে। মিলন-চঞ্চল হৃদয় তাই আপনাকে 'প্রভাত-পবন-ধৃত-শিশির,' * 'ঘূর্ণা-ক্ষুব্ধ সমুদ্র,' 'অশনি-ভীত বিহঙ্গম' ভাবিয়া বসে।

এই সাদৃশ্য-অনুসন্ধানই উপমা-উৎপত্তির একটা কারণ।

আবার, আমাদের মনে দুইটা বিপরীত ভাব অহরহ কাজ করিয়া যায় : একটা সঙ্কোচের, অপরটা বিস্তারের। একটা টানিয়া, গুটাইয়া, তাৎপর্য বাহির করিয়া সম্যক্ উপলব্ধির মাঝে সন্তুষ্ট হইতে চায় ; অপরটা ছাড়িয়া, বিশালতা, ব্যাপকতা দিয়া অসীম রহস্যের মাঝে হারা হইতে পারিলে বাঁচে। মনে কর, কাহাকে প্রশ্ন করা গেল, 'অমুক লেখকের লেখাটা কেমন ?' সে তৎক্ষণাৎ ভালো কি মন্দ, একটা কিছু বলিবে। আর তাহার প্রতি যদি সে নিতান্ত উদাসীন না হয়, তাহা হইলে সে বলিবে, 'অমুকের লেখা ?...তা'র দোষ-গুণ ?...তার যা আছে তা' এই-এই ; আর যা নেই, তা'ও এই আঙুল-ক'টার মধ্যে।' অগস্ত্য মুনির এক গণ্ডূষে সমুদ্র-পানের মত, স্বল্প বোধগম্য কথার মধ্যে ভাব চিন্তা বন্দী রাখিতে মানুষ প্রায়ই অভ্যস্ত। এবং সেই-গুলি তাহার পক্ষে কম সঞ্চয় নয় কাজে-কর্মে, আসরে-বাসরে সে-গুলি উদ্ধার করিয়া বাহবা পাইয়া থাকে ; সে গুলির আদর এত বেশী ! তাই ছেলেবেলা হইতে শুনিয়াই আসিতেছি, 'Mercy is twice blessed,'...'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্,'...'উদারচরিতানাম্ বসুধৈব কুটুম্বকম্,'...'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামাঃ',...'মন্ত্রের সাধন, কিংবা শরীর পাতন'...'জেনো ভাই, ভার থাকে গৌরবের পিছে'...ইত্যাদি।...অপর ধরণটা ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠে : সে বলে, 'ভাব-গুলিকে কথা দিয়া ছাড়িয়া দাও। বাঁধিয়া চাপা দিয়া গৌরব নেবার চেষ্টা কেন ?'...সে তখন বিচরণের বিশাল-ক্ষেত্রের অনুসন্ধানে লাগিয়া যায় : একটা ভাব আর একটি সীমাহীন ভাবের মধ্যে আনিয়া বাড়াইবার তখন চেষ্টা চলে। সেই-খানে উপমার সৃষ্টি, আর তাহার গৌরব, সৌন্দর্য সেই খানে। কালিদাস হইতে দু'টি শ্লোক উদাহরণ-স্বরূপে উদ্ধৃত করা যাক্।

'আসার-সিক্ত-ক্ষিতি-বাষ্প-যোগাদ্
মামক্ষিণোদ্ যত্র বিভিন্ন-কোশৈঃ।
বিড়ম্ব্যমানা নব-কন্দলৈস্তে
বিবাহ-ধূমারুণ-লোচনশ্রীঃ ॥'

'ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভি
শ্ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্র-লেখা
রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্য-নভঃপ্রদেশা ॥'

এখানে প্রথমটীতে বিবাহ-ধূম ও অরুণ-লোচনের অব-তারণা করিয়া, আর দ্বিতীয়টীতে আলো-অন্ধকারের এবং আকাশও শরৎ-মেঘ আনিয়া ভাবের পরিসর যত-দূর-সম্ভব বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের আমরা সম্পূর্ণ বুঝি, হৃদয়ঙ্গমও করি ; কিন্তু তবু ইহাদের নাগাল পাই না, সীমা স্পর্শ করিতে পারি না। তবু মানিয়া লইলাম,

* শেলীর কবিতা।

অসীমতা বাদ দিয়াও এ-ভাবখানি হয়ত, অন্য কতকগুলি কথার সন্নিবেশে একই গভীরতা লইয়া আমাদের মনে তাহার দাবী জানাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন কতক-গুলি ভাব আছে যে-গুলি উপমা ছাড়া আর কিছুতে প্রকাশ সম্ভব-পর নয়। কালিদাসের 'সঞ্চারিণী দীপ-শিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায়..........নরেন্দ্র মার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং,' বা রবীন্দ্রনাথের 'তুমি যেন ওই আকাশ উদার, আমি যেন এই অসীম পাথার, মাঝখানে তা'র আকুল করেছে আনন্দ-পূর্ণিমা।'— আমাদের মনে যত-খানি সত্য আনিয়া দিতে পারে, উপমা-বিহীন ভাষার মধ্যে ততখানি,—ততখানি কেন, একটুও প্রকাশ আশা করিতে পারি না।

উপমা আর-এক দিক্ দিয়া ভাব-সম্পদ্ বাড়াইয়া দেয় আগেরটী যেমন মাত্রার দিক্ দিয়া, শেষেরটী তেমনি সংখ্যার বহুলতায়। ব্রাউনিঙের কাব্যে যেমন নিক্ষিপ্ত-প্রয়োগ (Paranthesis), শেলীর কাব্যে সেই রকম, উপমাই অর্দ্ধেক সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব, সুষমা বহিয়া আনে। নূতন-নূতন রূপ চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে; স্বপ্ন-জগৎ খুলিয়া পড়ে; আমরা গহন ভুলে হারা হইয়া স্বপ্ন রচনায় লাগিয়া পড়ি। এবং এই-খানে একটী ভাব অসংখ্য রূপের মধ্যে প্রকাশ পাইয়া আপনাকে অশেষ করিয়া তুলে। কাব্যের মধ্যে যে 'অতি'র ভাব বা immensity, যা' প্রতিনিয়তই কাব্যকে জীবনের চেয়ে মহত্তর, বৃহত্তর, অধিকতর সুন্দর করিয়া তুলে, উপমাই সে-টুকুর অনেকখানি সহায়তা করিয়া থাকে। বৈষ্ণব কাব্যই তাহার প্রমাণ। নীচের উদ্ধৃত-অংশ-টুকু তাহারই একটী দৃষ্টান্ত।

'যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহা তাঁহা সরোরুহ ভরই॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি তরঙ্গ॥
....
যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ।
তাঁহি কমল পরকাশ॥
যাঁহা যাঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তাঁহা তাঁহা অমিঞা বিকার॥
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ।
তাঁহি মদন শর লাখ॥'

৩

এ পর্য্যন্ত জগতে জীব-জন্তু-তরু-লতা-বস্তুর মধ্যে স্পষ্ট কোনো বিভাগ-রেখা টানিতে পারা যায় নাই। একটীতে আর-একটীর ছোঁয়াচ্ লাগিয়া থাকে। স্পঞ্জ জন্তু, না উদ্ভিদ্?...জেলি তরল কি কঠিন?...আর একটু পরিচিত দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। সকাল, সন্ধ্যা ইহাদের, রাত্রি বা দিবস,—কাহার অন্তর্ভুক্ত করা যায়?...তন্দ্রা জাগরণের, কি ঘুমের?...এ গুলির মীমাংসা আজ পর্যন্ত হইল না। এ গুলি, না হয় মানিয়া লইলাম, প্রান্তোস্থিত দৃষ্টান্ত বা Marginal Instances! কিন্তু এমন্ কি বিজ্ঞান যাহা-দিগকে দুইটী বিভিন্ন জাতির অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, তাহাদের একটীতে অপরের ছায়া পড়িতে দেখি। এমিবা (Amœba) হইতে মানুষ পর্যন্ত, সব জীবই Cell দিয়া তৈয়ারি। এই ত গেল, শারীরিক দিকের কথা! আবার এভ্রিনফ্ (Evrienoff)'এর মতে, কীট-পতঙ্গ-উদ্ভিদ্ হইতে অসভ্য, সভ্য মানুষের মধ্যে Theatricality-র instinct-খানি অতি-ব্যাপক ভাবে কাজ করিয়া যায়।......বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত দুইটী কবির মধ্যে অনেক পার্থক্য-সত্ত্বেও আমরা যথেষ্ট মিল খুঁজিয়া পাই। দুইটী বিশিষ্ট চরিত্রের মধ্যে আমরা একই দোষ গুণের স্পন্দন অনুভব করি। এ গুলির অর্থ কি? ...মনে হয়, যেন জগতের রহস্য প্রত্যেকের মাঝে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া রহিয়াছে। উপমা একটীতে আর একটীর ছায়া আনিয়া এই আশ্চর্য রহস্য খানি ভরিয়া দেয়। আমাদের মনের প্রতিনিয়ত অবস্থা (mood) হইতে অবস্থান্তরে যাওয়ার যে বেগ, উপমা নূতন-নূতন

রূপের (Symbol) প্রকাশে নূতন-নূতন ভাবের ধারায় সে-বেগ-খানি জানাইয়া যায়। সেই-বেগ-খানি বিশ্বের সংযোগ বলিয়া * উপমার মধ্যে কবিতার বিশ্ব-ভাবের (universality) স্পর্শ আমরা পাইয়া থাকি।

একটু লক্ষ্য করিলেই আমরা দেখিতে পাই,—কোনো কোনো শিশুর কোনো কোনো বিশেষ রঙের প্রতি আশ্চর্য্য আগ্রহ। সেই রঙ-গুলি নহিলে তাহাদের চলে না। সে গুলি যেন তাহাদের জীবন-মরণ! মানুষের অতিচেতন (Subconscious) মন অলক্ষ্যে কতকগুলি জিনিষের সহিত পরিচয় করিয়া লইয়া গোপন-ঘনিষ্ঠ-সূত্রে আপনাকে বাঁধিয়া লয়। সেই খানে এত অদৃশ্য ভাবে তাহাদের দাবী-দাওয়া চলে যে, বাহিরে সহসা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের মনের প্রকাশের সময় সে গুলি কখন্ স্বতই বাহির হইয়া পড়ে। আমরা সেই গুলি ধরিয়া যদি চলিতে পারি, তবেই কবির মনটী অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারি; কারণ, অতিচেতন মনই মানুষের প্রকৃত জীবন।...আমাদের চেতন জীবন তাহার কাজ-কর্ম্ম, চিন্তার মাঝে এতখানি নিরবকাশ ব্যস্ততা লইয়া দেখা দেয় যে তাহার মধ্যে অতি-চেতনের সন্ধান পাওয়া অনেক-খানি অসম্ভব। তাই স্বপ্নের মধ্যে স্বতই আশ্রয় লইতে হয়; কারণ, সেখানে একটুমাত্র চেষ্টায় অতি-চেতনের ভাব-গুলি আমরা ধরিতে পারি।...পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের অতি-চেতন মন চেতন-মনের সম্পৃক্ত কতকগুলি বস্তুর পরিচয়ে চেতন-মনের অগোচরে নিজেকে প্রকাশ করিয়া বসে; চেতন মনের সেটুকুর আবিষ্কার, বেশীর ভাগই,—অন্ততঃ, আমার বেলা, অনেক দেরীতেই হইয়া থাকে। কবির উপমাই সেই অতি-চেতন ভাব-গুলির অলক্ষ্যে প্রকাশ। অপরের স্বপ্নে এবং চেতন ও অতি-চেতনের সম্পর্ক ও প্রভাবের বিচারে যখন আমার স্বাভাবিক-প্রবেশ নিষেধ, তখন নিজের দু'টী স্বপ্নের ও তাহার ঠিক্ পরের জাগ্রত মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতার কথাই পাড়া যাক্।

আমি একদিন স্বপ্নে একটী বিচ্ছিন্ন ভাবের মধ্যে জড়াইয়া ছিলাম; যখনই শুইয়া পড়ি, তখনই সে বিচ্ছিন্ন ভাবটী আপনাকে যত দূর সম্ভব বিস্তৃত করিয়া ভাসে। স্বপ্ন অনেক পরিমাণে নগ্ন; তাহার ভাব-গুলিও রূপের সীমা অতিক্রম করিয়া চলে। তাই বিচ্ছিন্ন ভাবখানিই শুধু কাঁপিতেছিল। সেখানি উৎপ্লতি। ঘুম ভাঙিতেই ইহার উৎস-ধারার অন্বেষণে বাহির হইতে থাকি। সে জন্য অনুসন্ধানের মাঝে শেলী'র

'As the flying fish leap
From the Indian deep,
And mix with the sea-birds half asleep'

বারেবারেই চোখে পড়িল। তাহার পর আমার পুরাণো কবিতা পড়িতেই দেখি, সেই ভাবটী উপমা-সূত্রে অনেক কবিতাতেই গ্রথিত আছে।

মাস তিন আগে এম্নি আর একটী ভাব স্বপ্নে উঠিত ডুবিত। সেটী—নিরুপায় গতি। সেটীও আগে পরে উপমায় বাঁধা থাকিতে দেখি। সে ভাবটী কালিদাসের একটী শ্লোকের মধ্যে দেখিতে পাইয়া আরও একটু বিস্মিত হই।...

'নিপাতয়ন্ত্যঃ পরিত স্তটদ্রুমান্,
প্রবৃদ্ধবেগৈঃ....................
প্রিয়ৈঃ সুদুষ্টাইব জাতবিভ্রমাঃ,
প্রয়ান্তি নদ্যস্বরিতাঃ পয়োনিধিম্॥'

উপরের শ্লোকে এবং ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর-প্রসঙ্গে কালিদাস বাছাবাছা কতকগুলি শ্লোকে 'সমীরণোত্থেব তরঙ্গলেখা পদ্মান্তরং মানস-রাজহংসীম্', 'মহীধরং মার্গ-বশাদুপেতং স্রোতোবহা সাগরগামিনীব,' 'সঞ্চারিণী দীপশিখেব,'—ইত্যাদি উপমার মধ্য দিয়া গতি-খানি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই-গুলি অতি-চেতনের প্রকাশ; ইহাদের উপর চেতন-মনের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব আরোপ

* আমাদের মন বা তা'র পরিচিত বস্তুগুলি নিত্য পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর লইয়া দেখা দেয়। পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরের ধর্ম্মই গতি বা বেগ। তাই সেই গতি বা বেগের মধ্য দিয়াই শুধু তাহারা পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রাখিয়া যাইতে পারে।

করিতে পারি না। কারণ, স্বনন্দার কথা-বার্তায়, যেখানে কবির যথেষ্ট চেতনত্ব অনুভব করি, পদে-পদে নিশ্চল মিলনের চেষ্টা ...কবির কাব্যের মূলে অনেক-খানি যখন অনুপ্রেরণা, উপমা-গুলি সেই অনু-প্রেরণার বিশিষ্ট সম্পদ্। অনুপ্রেরণা চেতন-মনের অতীত অনেক বার্তাই লইয়া আসে!...আমরা একটু চেষ্টা করিলেই দেখিতে পাই, বৈদিক যুগে যে-যে ভাব বা রূপ-গুলি একটীমাত্র স্তুতিতে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, পরবর্তী যুগে সংস্কৃত কাব্যে সেই-গুলি উপমা-রূপেই দেখা দিয়াছে, এবং পরের যুগের অনেক কিছুর সন্ধান আধুনিক সাহিত্যের উপমার মধ্যে মিলে। মানুষের বিশ্বমন যুগ হইতে যুগে উপমার মধ্য দিয়া সংযোগে-সংযোগে আপনাকে এম্‌নি-ভাবে জাগাইয়া তুলে।

উপন্যাস-নাটকের যেমন প্রধান চরিত্র-গুলির ছায়া অপ্রধান-গুলিতে নামিয়া বসে, মুখ্য-ভাবটী তেমনি উপমার উপর ডানা মেলিয়া কাঁপে। আখ্যানের যেমন গর্ভাখ্যান (sub-plot), কবিতার তেমনি উপমা। প্রধান ভাব আমাদিগকে ধরিয়া রাখে, অ-প্রধান রথীর অশ্বের মত আমাদের মুক্তি দেয়; আমাদের চিন্তা-ভাব-প্রার্থনা-অনুনয় পাখীর আকাশ-সঞ্চারের মত অনন্ত-সন্নিধানে ছুটিয়া যায়। প্রথমটী একতারায় একটী তান শুধু ঝঙ্কারিতে থাকে; শেষেরটী ওঠা-নামায়, মূর্চ্ছনায় আমাদের ভাসাইয়া দেয়! আর এইটীই আমাদের অতি-চেতন মনের বিশিষ্ট সম্পদ্। ঋগ্বেদের সুক্ত-গুলি মনে আনিতেই তাহার বিচিত্র উপমা-গুলি অতীতের জীবন-খানি ফুলের মত ধীরে-ধীরে খুলিতে থাকে; পাপ্‌ড়ি ছড়াইয়া পড়ে; উষার আলোর নৃত্য চলে; সৌরভ-রেণু আকাশে উড়িয়া জাল গাঁথিতে লাগে: আমরা মনের মধ্যে কোমল-অস্থিরতায় পীড়িত হইয়া আনন্দের স্বপ্ন বুনিতে বসি।

উন্মত্তা

(গভীর অরণ্যে উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ। দ্বারের সম্মুখে প্রশস্ত পথ। পথের উভয় পার্শ্বে জনতা। সকলে নীরব।)

(এক পার্শ্ব হইতে) কতিপয় লোক।

খোল' খোল' খোল'—দ্বার খোল', দ্বার খোল'—দ্বার খোল'।

একটী যুবক।

দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে ও কে?···মুখে কোন কথা নেই তবু শিকল ধরে' দাঁড়িয়ে ও কে?

(অপর পার্শ্ব হইতে) একজন বৃদ্ধ।

চুপ চুপ চুপ—তোমরা চুপ কর,—ওকে বিরক্ত কোরো না।

যুবক।

তোমরা ওকে চেন?

বৃদ্ধ।

হাঁ চিনি। আজ দিন কয়েক হলো, আমাদের গ্রামে এসেছে।

অপর একটী বৃদ্ধ।

ওর মুখ দেখ্‌লে আমার আর একখানা মুখ মনে পড়ে। বহুদিন সে নিরুদ্দেশ। আজও তা'র কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি।

অপর একটী যুবক।

আহা! বড় সুন্দর ঐ মুখ খানা।—দলে' যাওয়া চাঁপার মত বড় মলিন—বড় মধুর।

প্রথম যুবক।

মেঘের আড়াল ভেঙে চাঁদের আলোর মত ও'র দেহের আভা মলিন বসন টুটে ফুটে বেরিয়েছে। রুক্ষ-ধূসর-চুলগুলি বুকে পিঠে বাহুতে আলু-থালুভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

প্রথম বৃদ্ধ।

চুপ চুপ চুপ। তোমরা চুপ কর। ও'কে বিরক্ত কোরো না।

(সকলে নীরব রহিল। ক্ষণেক পরে সশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল।)

সকলে।

দ্বার খুলেছে, দ্বার খুলেছে, দ্বার খুলেছে।

প্রথম বৃদ্ধ।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যস্ত হ'য়ো না। সবার আগে ও এসেছে, ও'কে সবার আগে যেতে দাও।

প্রথম যুবক।

কৈ গেল না ত? দ্বার ধরে' দাঁড়িয়ে রইল?

প্রথম বৃদ্ধ।

রাজা স্বয়ং নেমে আস্‌ছেন—ও'কে স্বহস্তে ভিক্ষা দিতে।

দ্বিতীয় যুবক।

রাজা ও'র সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে গেল। রাজার মুখ-খানা কাগজের মত শাদা। রাজার চোখ দু'টী প্রভাতের তারার মত প্রভাহীন—অর্থহীন।

প্রথম বৃদ্ধ।

কী যেন দিতে এসেছিলেন। কিন্তু হাত আর উঠলো না।

প্রথম যুবক।

রাজাকে হাত ধরে' ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় যুবক।

পাগলী ফিরে দাঁড়ালে। হো হো করে' হেসে উঠ্‌লো।

প্রথম বৃদ্ধ।

ছাড়' ছাড়' তোমরা পথ ছাড়';—ওকে বাধা দিও না। ওকে যেতে দাও। যেখানে খুসী চলে' যাবে, কা'রও কথা শুন্‌বে না, কোন মানাই মান্‌বে না।

দ্বিতীয় যুবক।

চলে' গেল। ধূলো পাতা উড়িয়ে ছুটে চলে' গেল। ......এক নিমেষে গাছ পালার অন্তরালে কোথায় মিলিয়ে গেল।—দেখা গেল না।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ।

দ্বার বন্ধ হ'য়ে গেল।

প্রথম বৃদ্ধ।

চল চল। সকলে গ্রামে ফিরে চল।

সকলে।

চল চল চল। (একে একে সকলের প্রস্থান।)

(রাজোদ্যানের ভিতর থেকে)

কোলাহল থেমে গেছে। গ্রামবাসীরা সবাই চলে' গেছে।......দ্বারী! দ্বার খুলে দাও।

(সশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল।)

(ভিতরে রাজকবি, রাজা ও পারিষদদ্বয়।)

রাজকবি।

চল রাজা—চল বনটা একবার বেড়িয়ে আসি।

(সকলে বাহিরে আসিল।)

প্রথম পারিষদ।

বেড়াবার সময় ভাল!

দ্বিতীয় পারিষদ।

হাসছো কেন?

প্রথম পারিষদ।

দেখছো না?—পশ্চিমাকাশে একখানা মেঘ উঠেছে?

রাজকবি।

মেঘ উঠেছে?—(উর্দ্ধে চাহিয়া)—তা' উঠুক। তবু

চল। যখন একবার বেরিয়েছি তখন আর ফিরছি নে। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) তোমরা দেখেছ, পাগলী কোন্ দিকে গেল ?

দ্বিতীয় পারিষদ।

না দেখি নি।

প্রথম পারিষদ।

বনের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে গেল দেখ্‌তে পাওয়া গেল না।

রাজকবি—(গাছতলায় একটী লোক দেখিয়া)

ঐ লোকটাকে জিজ্ঞাসা কর—ও দেখে থাক্‌তে পারে।

প্রথম পারিষদ।

ওহে শোন শোন। (নিকটে আসিলে)—একটা পাগলীকে এধারে যেতে দেখেছো ?

লোকটী।

হাঁ দেখেছি।

প্রথম পারিষদ।

কোন্ দিকে গেছে বল্‌তে পার ?

লোকটী।

পুকুরের ধারে বস্‌তে দেখেছি। এখনো সেখানে থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে।

প্রথম পারিষদ।

পুকুরটী কত দূরে ?

লোকটী।

নিকটেই। বাঁ দিকে একটু গেলেই দেখ্‌তে পাবেন।

প্রথম পারিষদ। (দ্বিতীয় পারিষদকে)

চল চল,—দেখে আসি।

দ্বিতীয় পারিষদ।

গাছের আড়ালে আড়ালে যেতে হ'বে। নইলে আমাদের দেখ্‌লে সে পালাবে।

প্রথম পারিষদ। (যাইতে যাইতে)

পায়ের তলে শুক্‌নো পাতা মর্ম্মর করছে আর আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ছে।

দ্বিতীয় পারিষদ।

রাজকবি আস্‌ছেন না ?

প্রথম পারিষদ।

না। রাজাকে নিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

(উভয়ের বামদিকে প্রস্থান। পট পরিবর্ত্তন। বনানীর চিত্র। প্রাসাদের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না।)

(পারিষদদ্বয়ের প্রবেশ)

দ্বিতীয় পারিষদ।

পুকুরটা ঐ দেখা যাচ্ছে।..... একটু এগিয়ে দেখ দেখি ওপারে ঐ না ?

প্রথম পারিষদ।

হাঁ হাঁ ঐ ত।

দ্বিতীয় পারিষদ।

একেবারে সাম্‌নে নয়,—একটু আড়াল থেকে।

প্রথম পারিষদ।

একখানা মালা গাঁথ্‌ছে। গাঁথা প্রায় শেষ করেছে। মাঝে মাঝে তুলে ধর্‌ছে।

দ্বিতীয় পারিষদ।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। গাছের আড়ালে এস।

প্রথম পারিষদ।

মালাখানা ফেলে দিলে।

দ্বিতীয় পারিষদ।

আমাদের দেখ্‌তে পেয়েছে,—এবার পালাবে।

প্রথম পারিষদ।

তাই ত! চীৎকার করে' উঠ্‌লো ? জলের ধারে ছুটেছে। পা দুটো পিছ্‌লে যায় ত একেবারে জলেই পড়্‌বে।

দ্বিতীয় পারিষদ।

গেল গেল গেল—জলে পড়ে' গেল।

প্রথম পারিষদ।

চল চল—ওকে তুলি গে চল।

দ্বিতীয় পারিষদ।

ওপার থেকে কে যেন নাম্‌লে না ?

প্রথম পারিষদ।

আমাদের মহারাজ।

দ্বিতীয় পারিষদ।

ওর হাত খানা ধ'রেচেন।···সর্ব্বনাশ, রাজাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধ'র্‌লে যে ?

(উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব।)

প্রথম পারিষদ।

ভয় নাই, ভয় নাই। ও'কে নিয়ে পারের দিকে আস্‌ছেন।

দ্বিতীয় পারিষদ।

চল চল,—ধ'রে তুলিগে চল।

প্রথম পারিষদ।

রাজকবি কাছেই আছে। আমাদের যাবার আগেই ধ'রে তুল্‌বে।

দ্বিতীয় পারিষদ।

রাজকবি ডাক্‌ছেন,—চল চল,—ওপারে চল।

(উভয়ে দৌড়িয়া নিকটে আসিলে)

রাজকবি।

রাজা বড় ক্লান্ত। রাজার কাপড় বেয়ে জল প'ড়্‌ছে। তোমাদের একজন রাজাকে প্রাসাদে নিয়ে যাও।

(রাজাকে লইয়া দ্বিতীয় পারিষদের প্রস্থান)

ঝড় উঠ্‌বে। যত শীঘ্র পারা যায়, এর জ্ঞান ফেরাতে হবে। তুমি একখানা বড় পাতা নিয়ে বাতাস কর।

প্রথম পারিষদ (বাতাস করিতে করিতে)

একে প্রাসাদে নিয়ে গেলে ভাল হয় না ?

রাজকবি।

প্রাসাদে ? না প্রাসাদে না। এখানেই থাক্‌। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) অমন সবিস্ময়ে চেয়ে রইলে যে ?

পারিষদ।

তোমার ভ্রূযুগলে কুঞ্চন দেখে'।

রাজকবি।

(একটু হাসিয়া পাগলীর দিকে চাহিল)—দেখ দেখ —এক এক বার চোখ মেল্‌ছে।.. ...এবার জ্ঞান ফিরে আসছে।···শীঘ্রই সুস্থ হ'য়ে চাইবে।

(উভয়ে ক্ষণকাল নীরব)

পারিষদ।

চোখ মেলেছে।

রাজকবি।

হাঁ চোখ মেলেছে।.. চোখ দু'টী ঘোলাটে। পুকুরের ঘোলা জলে যেন একটী রক্ত পদ্ম এপাশ ওপাশ দুল্‌ছে।... চুলগুলি চোখের উপর এসে পড়েছে,—সরিয়ে দাও—সরিয়ে দাও। (দু'হাত দিয়া চুল সরাইতে সরাইতে) মেঘ উঠেছে,—সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেল্‌বে,—ঝড় উঠ্‌বে।

পারিষদ।

ধর ধর,—ও যে উঠ্‌তে যায়।

রাজকবি।

না না, বাধা দিও না—উঠতে দাও।

পারিষদ।

এখনো যে বড় দুর্ব্বল।

রাজকবি।

তা হোক্‌। বাধা দিও না। কোন বাধাই মান্‌বে না।......দেখ দেখ টল্‌তে টল্‌তে কেমন চ'লে যাচ্ছে।

পারিষদ।

আমার ভয় হচ্ছে, পাছে পড়ে' যায়।

রাজকবি।

একবার এগাছ একবার ওগাছ ধরে' ধীরে ধীরে চ'লে যাচ্ছে।—গাছপালার আড়ালে চলে' যাবে—আর দেখা যাবে না।

পারিষদ।

ওকি—কিসের কোলাহল? (একটু সরিয়া গিয়া গাছের আড়াল হইতে দেখিয়া)—বুঝেছি। ওদের শিকারের নেশা চেপেছে। রাজা আস্‌ছেন। এখনো ক্লান্ত। তবু ও'রা ওঁকে নিয়ে আস্‌ছে। ছি ছি—সবই ছেলেখেলা।

রাজকবি।

হাঁ খেলা, সবই খেলা—শুধু ভুল্‌বার আর ভোলাবার খেলা।

পারিষদ।

কবি! কবি। তুমি একবার চেষ্টা করে' দেখ, যদি ফেরাতে পার।

রাজকবি।

ফেরাবো? কাকে ফেরাবো? রাজাকে?

পারিষদ।

হাস্‌লে যে?

রাজকবি।

মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেল্‌বে। ঝড় উঠ্‌বে। তরু লতা ছিন্ন হ'য়ে মাটিতে লুটোবে।

পারিষদ।

থাম থাম;—নাঃ, এই পাগলের সঙ্গে তর্ক করা মিছে। দেখি যদি ফেরাতে পারি। (রাজা, দ্বিতীয় পারিষদ ও একজন শিকারী কাছে আসিলে দ্বিতীয় পারিষদকে) রাজাকে আবার নিয়ে এলে যে? একি পাগ্‌লামি! ঝড় উঠ্‌ছে—একি শিকারের সময়?

দ্বিতীয় পারিষদ।

রাজাকে কেউ আনে নি। রাজা নিজেই এসেছেন।

শিকারী।

মহারাজ! নিকটেই একটা ঝোপ আছে। কাল সেখানে একটা হরিণ দেখেছিলাম।......তিন চারখানা গাছ ছেড়ে আসুন......সেটা দেখ্‌তে পাবেন। (ঝোপ দৃষ্টিগোচর হইলে)........ঐযে........ঐযে........ঐখানে ঐখানে আছে।

প্রথম পারিষদ। (বাধা দিয়া)

থাম—থাম।

শিকারী।

না না—দেরী নয়।......কোলাহল শুনে এখনি পালাবে।

প্রথম পারিষদ।

ওকি! কিসের আর্ত্তস্বর।.........হায়! হায়! এযে করুণ নারীকণ্ঠ।

রাজকবি।

আকাশ ছেয়ে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঝড় ছুটে আস্‌বে। নিমেষে সব তুলে' ফেলে ধূলিসাৎ ক'রে দেবে।

দ্বিতীয় পারিষদ।

চল চল শীঘ্র চল। (সকলের ঝোপের দিকে প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন। ঝোপের ছবি।)

দ্বিতীয় পারিষদ।

আন আন—বাইরে আন।

প্রথম পারিষদ।

যা' ভেবেছিলাম।

দ্বিতীয় পারিষদ।

কে কে?

প্রথম পারিষদ।

এ সেই পাগ্‌লী।

রাজকবি।

ফুল পাতা শিউরে উঠ্‌ছে। ঝড় আস্‌ছে—ঝড় আস্‌ছে। এক নিমেষে সব ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে।

শিকারী।

তীরটা সোজা বুকে বিঁধেছে।

প্রথম পারিষদ।

রাজা—রাজা কোথায়?

দ্বিতীয় পারিষদ।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে,—একদৃষ্টে তীরটার পানে চেয়ে আছেন।

রাজকবি।

বৃষ্টি আসছে। মাটী ভিজে যাবে।...........চুলের আঁচল পেতে দিয়েছে। রাজা, তুমি বড় ক্লান্ত। ঐ আঁচলখানিতে ব'সো।

শ্রীভাস্কর গুপ্ত

নিভৃতিকা

ওগো রাণী
মর্ম্মে মোর তব বাণী
পশিয়াছে আজি,
কল্পনার রঙে রাঙা　　সুপ্ত স্বপ্নরাজি
উঠিয়াছে জাগি;
যার লাগি
শুষ্ক দুঃখে
ছিনু বসি অন্তরের　　উৎস পথ মুখে
সে আজি এসেছে মোর প্রাণে
গন্ধে গানে
সৌন্দর্য্যের স্বপ্নে রাঙা অন্তরের রাণী।

আমার জীবন পথে
যারা চ'লেছিল সাথে
উদয়াচলের যাত্রী　　আলোকের স্তম্ভিত সঙ্গীতে
তাহাদের নৃত্যে গীতে
যাহার পরশখানি মেলেনি অন্তরে
যার মধু ক্ষণতরে
পেয়েছিনু সমুদ্রের কল্লোল বাণীতে
পর্ব্বতের শুষ্ক ছায়ে, অরণ্যের মর্ম্মর সঙ্গীতে,
হিমাদ্রি-নির্ঝর নৃত্যে　　শৈবালের ঘন ছায়ে
মন্দবায়ে
মৌন সন্ধ্যা কালে
যারে দেখেছিনু শুধু আকাশের ভালে
অচঞ্চল আলোকের স্তম্ভিত নর্ত্তনে,
যার সনে
পুনঃ দেখা শ্রাবণের অশ্রান্ত বর্ষণে
মম মনে
তাহার ক্ষণিকা মূর্ত্তি
লভিয়াছে নব স্ফূর্ত্তি
আজি নব প্রভাতের প্রথম বাণীতে,—
আজি মোর চিতে
চঞ্চলেরে দিলে রূপ
অপরূপ
চিরন্তন বেদনার অশ্রান্ত সঙ্গীতে।

শ্রীবনমালী দাস

সন্ধ্যামুখী

—শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—

৩২শে জ্যৈষ্ঠ বৃষ্টি আরম্ভ হইল, ছাড়িল ২রা আষাঢ়। অবিশ্রান্ত তিন দিন বৃষ্টির পর আজ বিকালে আবার সূর্য্য উঠিল: বন, জঙ্গল, আকাশ, পৃথিবীর মেঘের অন্ধকূপ হইতে বাহির হইয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ছোট্ট 'শিবা'য় প্রথম বান পড়িয়াছে; লাল জল কানায় কানায় ছাপাইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের বালক-বালিকা বান দেখিতে দল বাঁধিয়া নদীর উত্তর পারে জড়ো হইয়াছে: কেহ হাসে, কেহ মারামারি করে, কেহ নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া কাঠি কুটা ধরিতে ব্যস্ত। নাপিতদের ছেলেটা একবোঝা খড়ে লম্বা দড়ি বাঁধিয়া বোঝাটা স্রোতে ছাড়িয়া দিয়া টানাটানি লাগাইয়া দিয়াছে, এমনি কত! অবেলায় 'শিবা'র তীরে [illegible] ছেলের হাট বসিয়াছে; তাহাদের কলরবে নদীর ক্ষুব্ধ কল্লোল কখন তলাইয়া গিয়াছে!

বেলা বেশী নাই। সূর্য্য যখন শর-বনের আড়ালে নেহাতই ঝুলিয়া পড়িল, ছেলের দল বাড়ী ফিরিতে ব্যস্ত হইল। সবাই ফিরিল,—রহিল শুধু রতু আর বীণা; বলিল "তোরা যা, আমরা খানিক পরে যাব; এখনো ঢের বেলা।"

আরো ডান ধারে সরিয়া গিয়া তাহারা জাম গাছের তলে বসিয়া বান দেখিতে লাগিল। কত গাছ, কত লতা-পাতা ভাসিয়া আসিয়া তাহাদের সম্মুখের ঘূর্ণিতে পড়িয়া, ডুবিয়া, উঠিয়া আবার ভাসিয়া যায়; কোনটাই তাহাদের দৃষ্টি এড়ায় না। কাঠ ভাসিয়া আসে, রতু বীণার দিকে চাহিয়া বলে, "দেখ বীণা, দেখেছিস্?" ঘূর্ণিতে কাঠ ডুবিয়া যায়, বীণা বলে, "যাঃ,—আর উঠ্‌বে না।" আবার কাঠ ভাসিয়া উঠে; দু'জনে হাততালি দিয়া হাসিয়া বলে, "দেখলি, এবার কারো কথাই সত্যি হলো না!"

ডালে জড়াইয়া সাপ ভাসিয়া আসে; দু'জনে হাত ধরিয়া দূরে সরিয়া যায়,—আবার আসিয়া বসে। দূরে নদীর ধার ধসিয়া ছপাৎ করিয়া জলে পড়ে, বালক-বালিকা চকিত হইয়া উঠে। তাহাদের বান দেখার বিরাম নাই। লাল, সাদা আঁকা-বাঁকা ঢেউ সন্ধ্যা-সূর্য্যের শান্ত কিরণে ঝলমল করিয়া একটার পিছনে একটা ছুটিয়াছে; তাহারা অবাক হইয়া দেখিয়াই যায় শুধু। উভয়ে একসঙ্গে ঊর্দ্ধে তাকায়,—ছেঁড়া খোঁড়া মেঘ একটার পিছনে একটা। রতু বীণার চিবুকে হাত দিয়া বলে, "দেখ্ ওই মেঘটা ঐ মেঘটাকে কেমন তাড়া করেছে!"

বীণা হাসিয়া বলে, "আর ধ'রলে ব'লে।"

রতু বীণার কাণের কাছে মুখ লইয়া বলে, "ঠিক্ তেমনি,—সেদিন যেমন তোকে আমি,—মনে পড়ে?"

বীণা রাগ করিয়া রতুকে ঠেলিয়া দিয়া বলে, "যা,—তোর খালি ঐ কথা!"

শরবনের আড়ালে আর সূর্য্য দেখা যায় না। রক্ত-মেঘ পূর্ব্বদিকের দিক্‌রেখা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া গিয়াছে। রক্ত-সন্ধ্যার আভায় নদীর লাল জল আরো লাল হইয়া উঠিয়াছে; সমস্ত নদীর ধারটা যেন কে গেরুয়া রঙে ছোপাইয়া দিয়াছে।

বীণা ডান হাতখানি রতুর হাতের কাছে চিত করিয়া বলে, "কার হাত বেশী লাল বল্ দিকিন্?"

সমস্ত রক্ত আকাশখানি বালক-বলিকার কর-তলে নামিয়া আসিয়াছে।

রতু হাসিয়া বলে, "তোরই, তুই যে আমার চেয়ে সুন্দর।"

রতু ধীরে ধীরে বীণার মুখের উপর চোখ দুটী তুলিয়া দেয় বলে, "সব কেমন লাল টক্‌টকে হয়েছে !"

বীণা তাড়াতাড়ি বলে, "তোকেও খুব ভালো লাগ্‌চে।...দেখ্‌ আজকের সন্ধ্যেটা দিনের চেয়েও ভালো, না ?"

বালক উত্তর না দিয়া বীণার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, যেন কি সেখানে হারাইয়া গিয়াছে !

বীণা হাসিয়া বলে, "কি দেখ্‌চিস্‌ অমন ক'রে ?"

রতু থতমত খাইয়া বলে, "ঐ দেখ্‌ আবার কি একটা ভেসে আস্‌ছে !"

দু'জনে দূরে ঢেউএর দিকে তাকাইয়া থাকে। বীণা হাততালি দিয়া বলিয়া উঠে, "দেখ্‌, দেখ্‌, কি ফুলের গাছ ভেসে আস্‌চে !"

রতু দূরে তাকায় ; বীণা বাঁ হাতখানি তাহার কাঁধের উপর রাখিয়া ডান হাতখানি বাড়াইয়া বলে, "ওখানে কি দেখ্‌চিস্‌ ? এই দেখ্‌ কাছে, আমার আঙুলের সোজা। আর ঘূর্ণিতে প'ড়লো ব'লে। হরি করে ধারে এসে লাগে !—মেলা ফুল ফুটে আছে।"

রতু উৎফুল্ল হইয়া বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি,—ফুলের গাছ।"

ঘূর্ণিতে পড়িয়া গাছ ডুবিয়া যায় ; বীণা মুখখানি ছোট করিয়া বলে, "আর উঠ্‌বে না ?"

রতু সাহস দিয়া বলে, "কেন উঠ্‌বে না ? যা পড়েচে, সবই তো উঠেচে।"

ধীরে ধীরে উঠিয়া গাছটী ধারে আসিতে লাগিল।

"ঐ উঠেচে" বলিয়া বীণা তাড়াতাড়ি উঠিয়া রতুর হাত ধরিয়া টান দিয়া বলিল, "পার্‌বি ?...বা—বা সন্ধ্যে-মুখী ফুলের গাছ !—রতু !"

"কেন পার্‌ব না ? আর একটু ধারে আস্‌তে দে।" বলিয়া রতু কাপড় গুটাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বীণা ব্যগ্রভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। রতু ধীরে ধীরে জলের ধারে গিয়া গাছ ধরিবার জন্য স্রোতের দিকে ঝুঁকিয়া হাত বাড়াইল।

বালকের পিছনে দুই তিন হাত পর্য্যন্ত নদীর ধার আস্তে আস্তে ফাটিয়া স্রোতে ভাঙিয়া পড়িল। "বীণা" বলিয়া বালক চীৎকার করিয়া উঠিল। বানের জল তরঙ্গ তুলিয়া পূর্ব্ব মুখে ছুটিয়া গেল।

বালিকা "রতু রতু" বলিয়া ধার পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিল, কিছুই দেখিল না : শুধু লাল জল শব্দ করিতেছে, ঘূর্ণি তুলিতেছে। দেখিল রতু নাই, সে একা। জলের কোল ঘেঁসিয়া তীরে বসিয়া 'শিবা'র জলে তাকাইয়া রহিল।

শুব্ধ সন্ধ্যায় নদীতীরে আবার তীর ভাঙিয়া জলে পড়ার শব্দ হইল ; নদীর কলকল শব্দের উপর দিয়া ওপার হইতে শৃগালের চীৎকার শোনা গেল : রক্তসন্ধ্যার লাল আভা রাত্রির ছায়ায় কালো হইয়া আসিল।

সঙ্গী

হে পাখী, দাঁড়াও তুমি !
তোমার ডানায় ওড়ার আবেশ-মাখা
প্রিয়ার চিহ্ন কাজলে রয়েছে আঁকা :
সুখে টল-মল আমাদের বন-ভূমি :
হে পাখী, দাঁড়াও তুমি !

হে পাখী, ব্যাকুল কেন ?
আমাদের দ্বারে সাঁঝের রঙের খেলা,
হর্ষ-চপল পবনের হেলা-ফেলা।
ঘন-অরণ্য তোমার কুলায় হেন :
হে পাখী, ব্যাকুল কেন ?

হে পাখী, কিসের ত্বরা ?
অকূল আঁধার তোমার ডানায় লুটি'
আসেনি এখনো খুলি' তা'র কালো ঝুঁটি।
তোমার আকাশ বনের প্রান্তে ধরা :
হে পাখী, কিসের ত্বরা ?

হে পাখী, কাকলি তব,
গৃহের প্রদীপে, আকাশ-তারায় আসি'
শিথিলিয়া দেবে বনের হরষ-রাশি :
ফুল-ছাপা স্বপ দু'হাত ভরিয়া ল'ব,
হে পাখী, কাকলি তব !

হে পাখী, পুলক ঝরে !
আমাদের বন তোমার স্বপন আনি'
পারে না দাঁড়াতে তোমারে নিবিড় টানি'
বিবশ তাহার বুকের সীমার পরে,
হে পাখী, পুলক ঝরে !

হে পাখী, তোমার এত !
আমাদের বন সুখে আজ ঢলোঢলো :
কোন্‌খানে ত্রুটি আমার, দেখেছো, বলো !
তোমায়-আমায়-মিলনে গোধূলি যেত !
হে পাখী, তোমার এত !

হে পাখী , কাহার আশে ?
ধরণীর কোন্-দুর্গম-বন-শেষে
প্রভাত ঘুমায় আঁধারের কোল ঘেঁসে' :
জাগাতে তাহারে বুঝি তা'র যা'বে পাশে !
হে পাখী, কাহার আশে ?

হে পাখী, বুঝেচি তোরে !
সুখে-ভরা বন আমার আজিকে নয় !
আমার স্বপন তোমার ডানায় রয়
ধরার শিয়রে আকাশের থরথরে :
হে পাখী, বুঝেচি তোরে !

হে পাখী, সঙ্গে লও !
আমার বিরহে আর্ত্ত বিলাপ তুলি'
সুখের বনানী ওড়াবে না রাঙা ধূলি !
গহন আঁধারে যেখানে বা তুমি রও,
হে পাখী, সঙ্গে লও !

হে পাখী, তোমার আমি !
ঘরের প্রদীপ রাখিবে না আর ধরে',
আকাশের তারা কোথায় যেতেছে সরে',
দূর বনানীর গুঞ্জন গেছে থামি' ;
হে পাখী, তোমার আমি !

শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার রায়

স্মৃতিরেখা

—শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র—

১৩, কপালকুণ্ডলা এ্যাভেনিউএ প্রত্যহ বিকাল বেলা আমাদের রীতিমত আড্ডা বস্‌ত। সে দিন বোধ হয় ভাদ্রের ১৭ তারিখ হবে—প্রেসিডেন্সী কলেজের তোরণ-দ্বারে মহা হৈ চৈ আরম্ভ হয়েছে, মাঝে মাঝে সেম্—সেম্ শব্দের আওয়াজ গগন পবন, বিশেষ করে' কলেজ ভবন মুখরিত ক'রে তুল্‌ছে—গাড়ী, ঘোড়া প্রচুর দাঁড়িয়ে রয়েছে সারে সারে দুই পাশে। আমার ব্যাপারটা বুঝে নিতে বেশী বিলম্ব হ'ল না—কারণ আমাদের সময়েও তো প্রেসিডেন্সী কলেজে Strikeএর কামাই ছিল না। সেদিন আড্ডায় আমাদের ঐ কলেজের ষ্ট্রাইক্ নিয়েই আলোচনা চল্‌ছিল—বিশেষ ক'রে জ'মে উঠেছিল তখন, যখন প্রেসিডেন্সী কলেজেরই 3rd year arts-এর একটী ছেলেকে পেলুম আমরা আমাদেরই আড্ডায়।

কিন্তু এ আড্ডা আমার টিক্‌ল না বেশীক্ষণ। মাথায় পাগড়ী বাঁধা কোমরে বেল্ট আঁটা একটা জোয়ান বলকায় পুরুষ এসে আমার হাতে একখানা কার্ড দিলে। আপনারা ভুল বুঝবেন না—সে থানার কোন পাহারা নয়—সামান্য একজন বেয়ারা মাত্র। দেখলাম কার্ডখানার ওপর ব্যাঁকা ব্যাঁকা অক্ষরে ছাপা র'য়েছে—মিসেস্ মৃণালিনী বাসু। রিষ্ট্-ওয়াচ্‌টীর পানে নিমেষের তরে তাকিয়ে নিলাম—পরক্ষণেই পকেট থেকে পার্কারপেনটা টেনে নিয়ে টাইম্ দিয়ে দিলাম সন্ধ্যা ৭টা—বেয়ারাকে ব'লে দিলাম ৭টার সময় যাচ্ছি।

যখন ৭টা বাজ্‌তে মিনিট পনের বাকী আছে, তখন গাত্রোত্থান করলুম বন্ধুমহল থেকে। দু'একটা খোঁচা দিয়ে যে তখন কেউই একটা কথা বলেনি, তা আমি স্বীকার কর্ত্তে পারিনে। তবে তাতে আমি দোষ ধরিনে। এই বিংশশতাব্দীর যুগেও যদি ছেলেরা অমন একটু ঠাট্টা না ক'রে কথা কয়, তবে বিংশশতাব্দীর মাহাত্ম্যই বা কোথায়, কিংবা সরস আমোদ অনুভবই বা করি কি রকমে!

যখন মিসেস্ মৃণালিনী বাসুর বিরাট প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলাম, তখন সময়টা একটু উত্‌রেই গিয়েছিল—বাড়ীতে পা' না দিতে দিতেই, শান্তি এসে গলাটা জড়িয়ে ধ'রে একটা চুমু দিলে—কচি কচি কথাগুলো বেরিয়ে প'ড়্‌ল মুখ থেকে তা'র কেমন একটা সরলতার প্রতিমূর্ত্তি নিয়ে, বল্লে—বিনুদা, বিনুদা—আমাকেও আজ নিয়ে যাবে না থিয়েটারে? ঠিক সেই সময়েই ফিকে মেঘ্‌লা রংএর একখানা সাড়ী প'রে মিসেস্ মৃণালিনী বাসু হাস্‌তে হাস্‌তে আমার কাছে এলেন. হাতের চমৎকার purseটা ঘুরাতে ঘুরাতে বল্লেন—"বিনয়, আজ আমরা 'বিজয়া' দেখ্‌তে যাচ্ছি নাট্যমন্দিরে। তোমাকে চাই আমরা আমাদের সঙ্গে। একটু সময় ক'রে নাও না?" নতুন প্লে'টা দেখ্‌বার আমারও ইচ্ছে ছিল বড় কম নয়—আর তা' ছাড়া থিয়েটার দেখা আমার একটা বাতিক হ'য়েই দাঁড়িয়েছিল। আমি তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে ব'লে উঠ্‌লাম—"মাত্র এই? এর জন্যে সময় অসময়?" তখন মিসেস্ মৃণালিনী বাসু ডাকলেন—বীথি। মুখ থেকে কথাটা প'ড়েছে কি পড়েনি, ঠিক এই রকম সময়েই আমি ব'লে উঠ্‌লাম—তবে, আমি আস্‌ছি বাড়ী থেকে! কিন্তু মিসেস্ বাসুর কথা সবটা শুনে নিজেই যেন কি রকম একটা লজ্জা পেলাম নিজের এই নিছক বোকার মত কথা কয়টায়! তখন আমি বেরিয়ে প'ড়েছি। মিসেস্ বাসু একটু সুর তুলে বল্লেন—"এস কিন্তু নিশ্চয়।" আমিও চেঁচিয়ে ব'লে গেলাম—'নিশ্চয়'।............তারপর যখন এলাম মিসেস্ বাসুর বাড়ীতে, দেখ্‌লাম তাঁরা সকলেই

প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে আছেন কেবল আমারই অপেক্ষায়। বীথি ব'ল্লে—আপনার জন্যই আজ কিন্তু দেরী হ'য়ে গেল। আমি তখন একটু বিস্ময়ের ভাণে বল্লুম—কী রকম? আমি খুব চট্‌পট্ ব'লেই এত quick হ'তে পেরেছি, নয়তো, এতো lateএ খবর দিলে, আর কেউ হ'লে হয়ত আস্‌তেই পার্ত্তো না।.........তারপর বল্লাম—আর তা' ছাড়া, তুমি যে যাবে নাট্যমন্দিরে, সে কথা আমি জান্‌তামই না.........বল্‌বার পরেই দেখ্‌লাম বীথির শুভ্র চিকণ টোল-খাওয়া গালের দুটো পাশ রাঙা হ'য়ে উঠল.........শান্তি যেন কোথায় লু'কিয়ে ছিল, দৌড়ে এসে আমার কোঁচার খুঁটটা ধ'রে বল্‌তে লাগ্‌ল—মাজ বীথিদি-ই আমাদের নে যাবে, বিনুদা.........আমাকে, তোমাকে আর মা'কে!...পরেশদাকে পর্য্যন্ত নে যাবে না ......আমায় থাক্‌তে ব'লেছিল...আমি কিন্তু থাক্‌তে পার্‌ব না...

তারপর বীথির Austin গাড়ীটায় উঠ্‌তে গিয়ে, আমি যেন সে কথাটা আর ভুল্‌তে পার্‌লুম না......নিজের অসাবধানেই ব'লে ফেল্লাম......মনে পড়ে বীথি, সে দিনকার কথা?

বিস্ময়ভরা কী এক অপরূপ মায়া নিয়ে বীথির কাজল-কালো অপলক বড় বড় চোখ দুটো আমার পানে চেয়ে রইল......আমি বল্লাম—'আমি কিন্তু ভুল্‌তে পারছি না, সে দিন সন্ধ্যাবেলাকার এই তোমার Austin গাড়ীটার কথা? বীথি মৃদু হেসে চোখ নামিয়ে নিলে—যেন কী এক ভুলে-যাওয়া স্বপ্ন নিমেষে তার নিছক সত্য স্পষ্টতাটীকে নিয়ে এসে তা'র চোখ দুটোকে ভারী ক'রে তুল্লো...... ব্যথায় কাতর হয়ে উঠ্‌লো আমার স্বভাবকোমল তরুণ হৃদয়খানা......আমি আস্তে তার আরো কাছে স'রে গিয়ে, মুখের কছেই তার মুখখানা আমার নিয়ে গিয়ে বল্লাম—কষ্ট পাও এতে তুমি বীথি?

সে শুধু তা'র সংযত একরাশ কুন্তলভারাবনত মাথাটী নেড়ে ছোট্ট গলায় ছোট্ট কথা ব'ল্লে মধুর পরিষ্কার স্বরে 'না'......মনে হ'ল ধরণীর যত অন্ধকার সব দূর ক'রে দিয়ে এক ঝলক বিজলী এসে হঠাৎ আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে—'পথিক এই যে তোমার পথ।'......... এমন সময়ে মিসেস্ বাসু এসে দ্রুত-ক্ষিপ্ত-স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন, এখন তোমরা ওঠনি? উঠে পড় বিনয়, বীথি উঠে পড়্! শান্তি ষ্টেয়ারিঙটা নাড়াচাড়া কর্ত্তে কর্ত্তে বিশেষ ব্যস্ত-সমস্ত স্বরে ব'ল্লে—খুব জোরে, লাল সিং খুব জোরে।.........আমরা সেই অবসরে সকলেই একটু হেসে নিলাম.........সত্যিই কিন্তু লাল সিং প্রায় থার্টি-ফাইভ মাইলস্ স্পিডে গাড়ী হাঁকিয়ে এনেছিল......শান্তির কথা সে অমান্য ক'রে নি......আমরা যখন গাড়ী থেকে নাম্‌লাম......প্লে তখন মাত্র তিন মিনিট হ'ল আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

মিসেস্ বাসু তাঁর এক মাদ্রাজী বান্ধবীর সাথে গিয়ে ব'সলেন—শান্তিও তাঁর কাছ ছাড়া হ'ল না। আমার তখন একটু যেন কী রকম লাগ্‌ল—কিন্তু তবুও দেখ্‌লাম মনটা যেন বেশ হাল্কা ও ফাঁকা হ'য়ে গেল; তখন মনে হ'ল নিশ্চয়ই মনের কোন নিগূঢ়তম নির্জ্জন কোণে কী একটা অজানা অস্পষ্ট ভারই লুকিয়ে লুকিয়ে ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল আমার শান্ত অচপল প্রাণখোলা ভাবটীকে। কিছুদূরেই যায়গা ক'রে নিয়ে ব'স্‌লাম—আমি আর বীথি!

প্লে'র শেষাশেষি গভীর এক উদ্বিগ্নতা যখন বিনয়ের বুকে বাসা বাঁধ্‌লো নরেন-নলিনীকে নিয়ে, বীথির মনে তখন কী ভাব খেলা কর্চ্ছে কে জানে, এক যায়গায় সে কিন্তু অস্বাভাবিক বেদনা-ভারে নুয়ে প'ড়ে ব'ল্লে Naren is a heartless fellow, নরেন হৃদয়-হীন। কথাগুলি যে অন্তরের সহানুভূতির বর্ম্ম প'রেই বেরিয়ে এসেছিল সত্য-মিথ্যার তীক্ষ্ণ চোখ-রাঙানিভরা বিচার-বিদ্রূপের ধার না ধেরে, তার সুস্পষ্ট প্রমাণই হ'চ্ছে বীথির সেই বেদনা-কম্পিত কাতর করুণ নম্র গলার স্বরটুকু!...সে বল্লে, 'বিজয়ার প্রাণ-ঢালা ভালবাসাটুকু নরেন বুকে নিতে পার্লে না!' নরেনের মত একনিষ্ঠ সাধক ভালবাসার মর্ম্মটী ধরে' নিতে পার্লে কিনা, সে নিয়ে

বীথির সঙ্গে আলোচনা চালান নিস্ফল বিবেচনা ক'রে কিংবা তা'র মনে ব্যাথার ক্ষত একটু বাড়িয়ে দেওয়া হবে এই মনে ক'রে—play-তেই খুব বেশী ক'রে attention দিলাম, বিজয়া দয়ালের বাড়ী আস্তেই বীথিকে বল্লাম —miss ক'র না এই situation-টা—খালি মাত্র এইটুকু বুঝে রাখ্‌লাম, তখনকার মত বীথিকে বোঝান ভারি শক্ত হবে—নরেন heartful কি heartless (নরেনের দরদ আছে কি না?)

তারপর যখন সকলেরই মুখে হাসি ও প্রাণে প্রীতি-টুকু ফুটিয়ে তুলে প্লে'টা ভেঙে গেল সে রাত্রির মতন, তখন সেই মাদ্রাজী বান্ধবীটী পাকড়াও ক'রে মিসেস্ বাসুকে নিজের কারে তুলে নিলেন—আমি তখন, সত্যি কথা বল্‌তে কি, ঠিক ফ্যাঁসাদ নয়, একটা কি রকম অতি তরল অবিন্যস্ত অস্বস্তি অনুভব করতে লাগ্‌লাম।···বল্লাম 'শান্তিকে দিন, আমাদের সঙ্গে তবে'। মাদ্রাজী রমণীর কোন মোহই শান্তিকে স্পর্শ কর্‌তে পারেনি...সে লাফিয়ে উঠে বল্লে... আমি বিনুদার সঙ্গে যাব'···মাদ্রাজী রমণীটী তখন শান্তিকে জড়িয়ে ধরে' ভাঙা বাংলায় বল্‌তে লাগল—'তা' হব না শান্তি···আমি তুমকে যেত্বে দিব না'···শান্তি একটু জড়সড় হ'য়ে গেল ··মাদ্রাজী রমণীটী সুমধুর হাস্য-ধ্বনি করিল···আমরাও সমস্বরে হাসিয়া উঠিলাম...শান্তি আর বায়না করিল না। মিসেস্ বাসু যাবার সময় ব'লে গেলেন—বীথি ভাল আছেতো?...তোমরা সাবধানে চলে' যেও···আমি বাড়ী যাচ্ছি এঁদের গাড়ীতে।

আমি যখন বীথিকে নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লাম, তখনই আমার মনে একটা আশঙ্কা জেগেছিল, বীথির অসুস্থ শরীর কোন গোলমাল আবার না বাধায় পথের মাঝখানে। আমি বীথিকে বল্লম—তোমার শরীর কী রকম? অসুস্থতা বোধ করছ কী? গাড়ীতে উঠে বীথি ব'ল্লে—না! তেমন কিছু নয়...তবে রগের কাছটা একটু ব্যথা ব্যথা কচ্ছে...তার জন্য ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই... আমি বল্লাম—যখন শরীর তোমার ততো ভাল নেই, আজ আস্‌তে গেলে কেন?...সে বল্লে 'নতুন প্লে'টা—আ

আমি বল্‌লাম 'যখনই প্রথম দেখ্‌বে, তখনই নতুন'... ···একটু হেসে বীথি ব'ল্লে—সত্যি কারণ কি বলব?

আমি বললাম—"আমি কি ঠাট্টা কচ্ছি?"

সেই রকম হেসে বল্লে—এলাম তোমারই জন্যে······ এতদিন আসনি কেন?

(দুই)

আমার বেশ মনে আছে। খুব পরিষ্কার এক শান্ত সন্ধ্যা। অসংযম-আকাশ তা'র উচ্ছৃঙ্খল রূপরাশি নিয়ে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে—যৌবন যেন তা'র প্রত্যেক রঙে, প্রত্যেক রেখাটীতে পর্য্যন্ত ফেটে পড়্‌ছে এক অসীম ব্যাকুলতাভরা মত্ততা নিয়ে। টালীগঞ্জ সাইড্-এ যে লেক্‌টা হ'য়েছে—তারই একটা পাশে তখন বিভোর হ'য়ে ব'সে আছি আমি। এমন সময় আমার এক বন্ধু এসে অকস্মাৎ য়্যাটেন্‌শন্ (attention) আকর্ষণ কর্‌বার যে মামুলি পন্থাটা অবলম্বন কর্লেন, তা' আমি আজও ভুলি নি। আমি বলি কী, অতটা জোরে না হ'লেই ছিল ভাল—আমার মত দুর্ব্বলের কাছে ও রকম একটা প্রচণ্ডতা সীমার মাঝে অসীমতার আকারই ধারণ ক'রেছিল বলতে হবে। যাক্ সে কথা, আমি চেয়ে দেখ্‌লাম...বন্ধু কিন্তু যেরকম আস্‌ছিলেন অন্য পাঁচজনের সাথে, সেইরকমই চালে চ'লে গেলেন তাঁদের নিয়ে......শুধু তাঁর হাতের একটা নিদারুণ স্মৃতিই র'য়ে গেল আমার সাথে। দাঁড়িয়ে প'ড়লাম······পাশে দেখি 'শিউলি'; শিউলিও আমায় দেখে ব'লে উঠ্‌ল—কেমন আছেন?

আমি বল্লাম—হঠাৎ এ কথা?

শিউলি হেসে ব'ল্লে—আপ্‌নাকে আজ ক্লাবে দেখ্‌তে পাইনি ব'লে?

তারপর দু'জনেই আমরা এলাম শিউলির বাড়ীতে—বলা বাহুল্য মাত্র, সে-সন্ধ্যায় চা পানের ব্যবস্থাটা শিউলির বাড়ীতেই আয়োজন করা হ'য়েছিল···যখন এক চুমুক দিয়ে মুখটা তুলে নিয়েছি, তখন, কি ঐ-রকমই একটা

সময়ে, শিউলি ব'ল্লে—বীথির সঙ্গে আপনার চেনা হ'ল কি ক'রে ?

আমি আর একটা চুমুক দিয়ে বল্লাম, 'বীথিকে আপনি জান্‌লেন কি ক'রে ?'

শিউলি ব'ল্লে—আমি? আমরা যে একসঙ্গে I. A. পাশ করেছিলুম।......তারপর ও যায় ওর মা'র সঙ্গে Oxford-এ...ওতো এসেছে এই বছর খানেক...আমি তখন 5th year-এ পড়ি।

চা খেতে খেতেই কথা চল্‌ল।

আমি বল্লাম—আমার সঙ্গে বীথির চেনা তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে ?

শিউলি দুষ্টু হেসে বল্‌লে—খড়ি পেতে।

আমি বললাম—বল্‌বে না তো ?

'আপনার জেনে কি লাভ হবে ?'...আমি একটু ভেবে বল্লাম—বুঝেচি !...শিউলি তখন একটু সঙ্কুচিত স্বরে ব'লে উঠ্‌ল 'কি ?'

আমি বল্লাম—জান্‌লে কি ক'রে ?

শিউলি তখন হেসে ব'ল্লে—ওঃ, তাই ভাল।...আচ্ছা বলুন কি ক'রে ?

"কাল তুমি নাট্যমন্দিরে গিয়েছিলে।"

"সত্যি, তাই।" আমি বল্লুম—তুমি একা ?

'না, লীলা, ইলা—ওরাও ছিল আমার সঙ্গে।' তার পরেই শিউলি ব'ল্লে—Classএ গেলে না, সে কি নাট্য-মন্দিরের করুণায় নাকি ?

আমি বল্লাম—অনেকটা তাই বটে।

'তুমি গেলে না, কসুর হ'ল আমার...সকলেই ওরা ঠাট্টা ক'রতে লাগল—কিগো, বিনয়বাবু কোথায় ?

তখন আমার চায়ের Cupটা নিঃশেষ হয়ে এসেছে—সেটা রাখতে রাখতে আমি একটু মুচ্‌কে হেসে বল্লাম—ঠাট্টা কেন ?

শিউলি তখন অস্বাভাবিক লজ্জায় তার মুখখানা নামিয়ে নিলে। আমার এখনো মনে পড়ে—শিউলির সে কি গভীর লজ্জা।—সে-দিন থেকে বুঝেছিলাম—শিউলি আমায় জুড়ে ব'সে আছে কতখানি।...তখন মহাসমস্যায় পড়েছিলাম একধারে বীথি আর একধারে শিউলি !

সে ঘরে তখন আমি আর শিউলি...আর দু'জনের মাঝে এক অচঞ্চল নীরবতা।

শিউলিই নীরবতা ছিন্ন ক'রে কথা বল্লে প্রথম। আমাকেই দোষী ক'রে বল্লে সে—বাঃ, বেশ চুপ্ চাপ্ যে বড় ?

আমি বল্লাম—কী রকম ?

'নিজের কথাগুলো শুনে নিলেন...কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না ?

তখন আমার মনে প'ড়ল—সে কী জান্‌তে চায়—বীথির সঙ্গে আমার চেনা হ'ল কি সূত্রে ? আমি তখন বল্লাম—ওঃ, সে এক মহা ভয়ানকতার মধ্যে দিয়ে। শিউলি ফিক্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল, ব'লে ফেল্লে—ভয়ানক-তার মধ্যেই কাব্যসুধা ?

আমি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বল্লাম—সে একদিন বিকেলবেলার কথা ? কপালকুণ্ডলা এ্যাভেনিউ-এ বিজয়দের বাড়ীর রকে ব'সে আছি এমন সময় একখানা Austin গাড়ী বাঁধারের পোলের ওপর থেকে নাম্‌ছিল অত্যন্ত abnormal speedএ—আমি তখন বিজয়কে বল্‌ছিলাম—কি দুঃসাহস দেখ্, এত জোরে গাড়ী চালায় ? ঠিক সেই সময়েই Austin গাড়ীটার সামনে একটা বোঝাই লরী এসে পড়্‌তে, বীথি Sudden একটা turn নিতে গিয়ে টাল্ সাম্‌লাতে পারল না—গাড়ীটা রাস্তার boundary-বাঁধা শক্ত কাটে এসে এক ভীষণ ধাক্কা খেল, বীথি ছিট্‌কে এসে প'ড়ল আমার পায়ের কাছে, গাড়ীটা চ'লে গেল আর এক ধারে কাটটাকে ভেঙে চুরমার ক'রে।

আমি তখন বীথিকে কোলে ক'রে তুলে বাইরে ঘরের তক্তপোষটাতে শুইয়ে দিলুম—বিজয় এর মধ্যেই এক বাল্‌তি ঠাণ্ডা জল এনে দিলে...আমি আস্তে আস্তে চোখে মুখে মাথায় ছিটিয়ে দিতে লাগলাম...দুচার গাছি চূর্ণ

কুন্তল সরাইয়া দিয়া ললাটে তাহার পাখার বাতাস করিতে লাগিলাম···ধীরে ধীরে বীথি চোখ চাহিল···ওঃ, আমার আজও মনে পড়ে, কি সুনিবিড় শান্তি, কি বিপুল বিরাম, কি সুস্পষ্ট কৃতজ্ঞতাই না ফুটে উঠেছিল তখন তার অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে!···আবার চক্ষু মুদিল, আবার চাহিল, আবার কহিল—এবার নীরবতায় নয়, ক্ষীণ স্তিমিত কণ্ঠে—একটু দয়া করুন···বাড়ীতে phone করুন। 'Phone' নম্বরটা নিয়ে আমি রিং কর্ল্লাম—শেষে ব'লে দিলাম, ভয়ের এখন কোন কারণ নেই···আমি পৌঁছে দিচ্ছি half an hourএর (আধ ঘণ্টার) মধ্যে।

উত্তর আসিল—"I'm ever grateful to you." (আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ)।

বীথি একটু সুস্থ হ'তে, আমারই ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এসে আমারই গাড়ীতে উঠ্‌লো।

...এমন সময় শিউলি বল্লে—'সেদিন বেতার বার্ত্তায় আকাশবাণীর মধ্যে এটা শুনেছিলাম না?'

আমি বল্লাম—তা' হবে।

শিউলি কথা আর না বাড়িয়ে বল্লে—তারপর? তারপরের ঘটনাগুলো আর না ব'লে—আমি বল্লুম 'এই রকমেই বীথিদের সাথে চেনা হল আমার।'

(তিন)

মাসখানেক প্রায় হ'য়ে গেল···বীথিদের বাড়ী যাওয়া কমাতে বাধ্য হয়েছিলুম—কিন্তু চিঠি দেওয়ার কি Phone করার কামাই ছিল না। শিউলির সাথে রোজই ক্লাসে দেখা হ'ত বটে...কিন্তু আমায় আর শিউলি তেমন পেত না...সত্যি কথা, আমি একটু বিমনা হ'য়ে প'ড়েছিলুম বিশেষতঃ বীথিকে নিয়ে। বাড়ীময় যখন কথাটা ছড়িয়ে প'ড়ল যা' সত্য তা'র তিনগুণ ছাপিয়ে, তখন কেমন যেন একটা জোর-করা-জেদ আমায় পেয়ে বস্‌ল—যে ক'রে হোক্ বীথিকে আমায় পেতে হবে। আজও আমার মনে বেশ জ্বল্‌জ্বল্ করছে সে সময়টা। তখন আমার ইউনিভারসিটী Classএ (ক্লাসে) পূজাবকাশ আরম্ভ হ'তে বাকী আছে মাত্র ক'টা দিন...আমি একদিন সহসা বীথির ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম...দেখ্‌লাম পরেশ আর বীথি···বীথি তখন ঈষৎ অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল—ঠিক যেন কী একটা অপকর্ম্ম ক'রে ফেলেছে। আমি বল্লাম—বীথি, আমি-তো চল্লাম 'অজন্তায়'। বীথি চোখদুটো বড় ক'রে বল্লে—যেন সে কতই ভয় পেয়েছে—in that wild place?—সেই ভয়ঙ্কর যায়গায়? আমি হেসে বল্লাম—wild (ভয়ঙ্কর) মোটেই নয়···আর তা' ছাড়া—

বীথি শিউরে উঠে বল্লে—wild নয়তো কি? শুনেছি, না পাওয়া যায় well-protected (সুরক্ষিত) কোন কাম্‌রা, না পাওয়া যায় পেটে দেবার মত কোন খাদ্য।

আমি সহজ সুরেই বল্লাম—ও দুটো থাক্‌লেও আমরা বড় ওর উপর ভর কর্ত্তুম না।

বীথি বল্লে—কী জানি···আপনাদের...?

পরেশ একটু হেসে উঠ্‌ল···আমার শরীরের সমস্ত রক্ত গরম হ'য়ে উঠ্‌ল।

দুপুরবেলার ঘুমটা বেশ নিরালায় হ'য়ে গেছে... আমি তখন আমার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছি—পা দুটো সাম্‌নের টেবিলের উপর। হয়তো তখন বীথির কথাই ভাব্‌ছিলাম বোধ করি, নয়তো মনটা কেন ধূমাচ্ছন্ন, অস্বস্তি ব'লে প্রতিভাত হ'চ্ছে?···যাক্ ভাবলাম, শিউলিকেও খবর দেওয়া একটা দরকার···শিউলির কথা মনে হ'তে হ'তেই দেখ্‌লাম শিউলির গাড়ীটা এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছে···আমি বল্লাম—'উঠে এস।'

শিউলি ব'ল্লে—একটা সংবাদ শুনে এলাম, সত্যি?

'না জান্‌লে তারিফ করি কেমন ক'রে?'

বীরেন বাবু বল্লেন—"আপনারা অজন্তা-যাত্রী।"

আমি তখন একটু বিস্ময়ের ভাণে বল্লাম—তোমায় বলিনি?···না...হয়ত ভুলে গেছ তুমি...বনমালী, বীরেন, সৌরী সকলেই যে যাচ্ছি আমরা এই পূজোর ছুটিতে!'

শিউলি আর কোন ভণিতার ধার দিয়ে না গিয়ে ব'লে উঠল—আপনারা ভারি fortunate (সৌভাগ্যশালী)

…কেমন চমৎকার জীবনযাত্রা করতে চ'লেছেন… আমারও আন্তরিক ইচ্ছে ছিল—আপনার সঙ্গ নি…কিন্তু জানেন তো…আমরা জন্ম থেকেই পঙ্গু…একটা ধার আমাদের মুচড়ে ভেঙ্গে দেওয়া হ'য়েচে !'

শেষের কথাগুলো সত্যি আমায় ব্যথা দিল তখন—তখনকার বিদ্রোহী মনখানা আজও যেন চোখের সামনে আগুনের অক্ষরে জলছে।

মাস দুই চ'লে গেছে।

সে কথাটা আজও আমি ভুলতে পর্চ্ছি না—জানি না জীবনে কখন পারবো কি না? হয়তো এ ঘোর অন্যায়, সত্যই খুব অনুচিত! কিন্তু তবুও…তবুও…মনের ওপর কোন হাতই নেই আমার…সে ঘা-টার কথা শত চেষ্টা সত্ত্বেও যে জেগে রয়েছে দিন দুপুর!…সেদিন 'অজন্তা' থেকে ফিরে এসে যখন প্রথমেই গেলাম বীথিদের বাড়ীতে—আপনাদের বলব কী—যে ব্যাপারটা প্রথমেই প'ড়ল আমার পোড়া চোখদুটোয়, তা' আমাকে ব্যাকুল বিহ্বল না ক'রে থাকতে পারেনি…আমি দেখলাম…বীথির মধ্যে যা' কিছু দেখতে পাব আধ-ফোটা কোরকের মত—যা' চেয়ে আছে আমারই পথপানে এক অসামান্য উদ্‌ভ্রান্ত পিপাসা নিয়ে, তার কোনটারই আভাস পেলাম না তার কি মুখ থেকে, কি চোখ থেকে…বরং পেলাম তা'কে ঠিক সেদিনকারই মত, যেন আজও কী একটা অপকর্ম্ম ক'রে ফেলেছে…পরেশকে দেখে আমার মতিভ্রান্ত হ'য়েছিল কিনা সে মুহূর্ত্তে—কে জানে?…চা'য়ের পেয়ালাটা দেখিয়ে আমি তবে একটু টিপ্পনীর ভঙ্গিমাতেই বীথিকে ব'লে ফেল্লাম তখন, বাঃ, বেশ চ'লেছে আপনাদের!

"অল্প কিছু আহার মাত্র,
আর একখানি ছন্দ-মধুর কাব্য হাতে নিয়ে।"

হয়তো একটু ব্যথা পেল বীথি! চোখটা সে ঘুরিয়ে নিলে। আমি বল্লাম—বিদায় বীথি!

ওঃ, সেদিন কি মহা মত্ত আনন্দেই না শিউলিকে পেয়েছিলাম তা'র নির্জ্জন কক্ষটীতে! কী প্রচণ্ড উন্মত্ততাতেই না নিগূঢ় ভালবাসার অব্যর্থ দান প্রতিদানে দু'জনে অধীর হ'য়ে উঠেছিলাম সেই নিভৃতিকাময়ী সন্ধ্যা-রাঙিমার অপূর্ব্ব মোহ পরশটুকুকে আপনাদের অন্তরের সাক্ষী ক'রে নিয়ে!

বীথির নিরালা-জীবনযাত্রা দেখে শিউলি আজও নাইতে, শুতে, স্মরণ করিয়ে দেয় আমায়—কী অন্যায় অভদ্র ব্যবহারই ক'রে এসেছিলাম আমি সেদিন, বীথির অনাবিল প্রেম-পুণ্য প্রাণখানি নিয়ে!

যৌবনের রঙ

শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়

কাহাকেও ছ'সাত বছরেরটী দেখিয়াছি, বছর দুই তিন পরের দেখা। দেখি, সে যেন দু'তিন বছরের চেয়ে ঢের বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে। আর একটী জিনিষ যা চোখে দেখেই লাগে—তাহার তনুতে যৌবনের রঙ ধরিয়াছে। অসুখে অনেককেই ভুগিতে দেখি। কিন্তু তাহার বয়স যদি যোলর কোঠায় আসিয়া থাকে, তাহার দেহের শ্রীর যতই কেন অপচয় ঘটুক না, একটু সারিবার মুখে আসিলেই তাহার অঙ্গের কোলে কান্তির রেখা ফুটিতে থাকে—বুঝি, ইহার গায়ে যৌবনের রঙ লাগিয়াছে। যেমন আম্রমুকুলের ফলোদ্গমের পূর্ব্বাভাস জানায় শুক্‌না মুকুলের মাঝে হঠাৎ-ছেয়ে-যাওয়া একটা স্নিগ্ধ শ্যামলিমা তেমনি যুবকের অসুখের পরই মুখে, চোখে, গালে,

আঙুলের গায়ে যৌবনের ছাপ দিয়া যায় একটা তরুণ লাবণ্য, যার জ্যোতি সকলের—নিতান্তপক্ষে আমার, চোখকে একটু মুগ্ধ ও ক্ষুব্ধ না করিয়া যায় না। মুগ্ধ করে কেন না, একটী নূতন মানুষকে সে আমার অন্তরের চোখের কাছে চিনাইয়া দেয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না এইজন্য যে, যে মানুষটী আজ আমার হৃদয়দ্বারে আঘাত দিল, সে আজই হোক, কালই হোক নিজের স্বরূপটী তাহার কাছে অকপটে প্রকাশ করিবেই—যাহার নাড়া তাহার মনে একটা তোলপাড় আনিয়া তবে নিষ্কৃতি দিবে: সে রূপসম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হইয়া পড়িবে; নিজেকে বারে বারে আর্শীর সম্মুখীন করিবে; সার্শীর আড় দিয়া ছাদের কোণে উঁকি মারিতে শিখিবে; অপরের রূপের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করিয়া নানান খুঁৎ ধরিবে; নূতনের নেশা-ঘোরে উপন্যাসের রূপ বদ্লাইয়া যাইবে; যাহার কড়া শাসনের উৎপাতে উপন্যাসে হাতেখড়ি হয় নাই, সে বন্ধুদের বাড়ীতে বসিয়া পরম সুখের আস্বাদন লইবে; যে ভ্রূ-যুগল সর্ব্বদা উৎফুল্ল-চঞ্চলতায় কখনো কুঞ্চিত, কখনো প্রসারিত হইত, এখন তাহা নিরুদ্দেশ চিন্তার ছায়ায় ঘন ঘন আনত হইবে; আঁখির ঠারে, হয়ত বা কথার ধারে, নিজের বেশ-বিন্যাস-পটুতার প্রশংসা অন্ততঃ বন্ধুদের কাছে ভিক্ষা বা আদায় করিবে; কেমন একটা অস্বস্তির ছোঁয়াচে জীবনের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিবে; কেমন একটা সৌন্দর্য্যের কল্পনার আতিশয্যে কাব্যপাঠে মন টানিবে বা কবিতা লিখিবার ঝোঁক চাপিবে; 'মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখি জাগো' ইত্যাদি ধরণের গানের অফুরান্ সুর কণ্ঠে বাসা বাঁধিয়া সময়ে অসময়ে কাণে না আসিতেই কাজ গুলাইয়া পাখীর মত প্রাণকে পাখা মেলিতে শিখাইবে; কণ্ঠে সুর বসুক আর নাই বসুক, গুন্ গুন্ করিয়া গলা সাধিতেই হইবে, যেন সে গানটীকে কাহারও মনের মন্দিরে লিখাইতে চায়। এমনি এমন কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ স্বতঃই প্রকাশ পায় যাহাতে যৌবনের আবির্ভাব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সর্ব্বোপরি দেখা দেয় এমন একটী আত্মস্থতা, বা কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মসর্ব্বস্ব-ভাব, যাহা একান্তই যৌবনের নিজস্ব।

এইরূপ যৌবনরঙে রূপান্তরিত হওয়া যে মানবমনের স্বাভাবিক সুস্থতার ও ক্রমোন্নতির চিহ্ন, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। এই স্বাভাবিক পরিণতির স্বতঃ-স্ফূর্ত্তি কিন্তু আমাদের দেশে, বিশেষতঃ সহরে, অনেকেরই জমিয়া উঠিবার অবসর পায় না। এখানে অনেকেই মনের দিক দিয়া হয় অকালবৃদ্ধ, না হয় সর্ব্বথা শিশু; হয় পরীক্ষাভারগ্রস্ত, সুতরাং একেবারে নিরীহ, না হয় উত্তেজনার পর উত্তেজনা সঞ্চয়ে অযথা চঞ্চল। যাহাদের দূর থেকে যুবা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, নিকটপরিচয়ে বুঝিয়াছি তাহাদের মনে যৌবনের আঁচ লাগেনি; এমনি একটা শীতলতার গুণ্ঠনে, কুণ্ঠায় সঙ্কোচে নিজেদের জড়াইয়া রাখিয়াছে যে, দ্বারে আগত জাগ্রত বসন্তের গম্ভীর আহ্বান তাঁদের প্রাণে উদ্দীপনার ক্ষীণ স্পন্দনটুকু জাগাইতেও ভুলিয়া যায়।

যাহাদের মনে এই যৌবনফাগের রঙ ধরেনি, তাহাদের জীবন প্রকৃতির দিক থেকে সম্পূর্ণরূপেই বিসদৃশ ও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি একদিন-না-একদিন আপনার নির্ম্মমহাতে ইহার প্রতিশোধ দিবেই এবং আমাদের মনও সে বিধানে অজ্ঞাতসারে সানন্দেই সায় দিবে। কিন্তু এমনও কেহ কেহ আছে, যাদের যৌবনের ফুল না ফুটিতেই সন্ধ্যার ঝঞ্ঝায় ঝরিয়া যায়; যাদের জীবনে যৌবনের দুঃসহ আবেগ শুধু ভ্রান্তির পর ভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া মরীচিকার মত উদ্‌ভ্রান্ত, দিক-ভুল করিয়া দিয়াছে; যাদের জীবনে যৌবনের সুখ বিদ্যুৎবিলাসের মত নিমেষের স্মৃতিমাত্র; তাদের জীবনের ব্যর্থতার গভীরতা কী দিয়া মাপিবে! কিন্তু এই বিস্ময়বিমূঢ়তার অন্তরালেই আত্মগোপন করা ত যৌবনের ধর্ম্ম নয়; এযে নিরীহতারই তদ্ভিন্ন রূপ, নিরুৎসাহেরই প্রচ্ছন্ন নামান্তর। তাদের জীবনে প্রকৃতির প্রতিশোধের তীক্ষ্ণ জ্বালা ঠিক স্পর্শমণির কাজ করেনি, বরং আপনার অন্তরতম স্বরূপটাকে বিকৃত ও অসুন্দর করিয়া চোখের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিয়াছে। এখন

প্রকৃতির স্নিগ্ধ কোন প্রলেপন তাহারা চায় না; চায়—তাহাদের অতীত সুন্দর স্বরূপটীকে আর একজনের হৃদয়ের ছায়ায় রাখিয়া যে সুখ, যে আনন্দ, সেই নির্ম্মল, নিবিড়, শান্ত সমাহিত সৌন্দর্য্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। কিন্তু আমরা যে আমাদের যৌবনের স্বপ্নে বিভোর হইয়া, আত্ম-সুখের চর্চ্চায় একাগ্র হইয়া, তাহাদের সেই ব্যথিত, স্নেহাতুর হৃদয়ের দাবী একেবারেই বিস্মৃত হই। সেই পীড়িত হৃদয় অজস্র সহানুভূতির তাপে জাগাইয়া, সচেতন করিয়া, চোখের জলে বর্ত্তমানের ধূলা আবর্জ্জনা সরাইয়া, তাহাদের অতীত রূপটীকে চিনাইয়া দেওয়ার কর্ত্তব্যটী প্রায়ই ভুলিয়া যাই—এতই আমরা নিজেদের বাহিরটাকে লইয়া ব্যস্ত থাকি। কিন্তু যৌবনের রঙে রাঙিয়া থাকা এত সহজ নয়। যৌবনের আত্মস্থতা অপরিহার্য্য, কেননা সে আপনার সম্বন্ধে অতি অধিকমাত্রায় সজাগ; কিন্তু সে আপনার সীমায় ধরাবাঁধা থাকিতে আদবেই ভালবাসে না—আপনাকে কেন্দ্র করিয়া বহুতে বিস্তৃত হইয়া যাওয়াই তাহার স্বভাব। তাই যাহারা আত্মসর্ব্বস্ব, তাহারা যৌবনমন্দিরের বাহিরেই থাকিয়া যায়; মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটনে যে সোণার কাঠির স্পর্শ মন্ত্রবৎ কার্য্য করে, তাহার কথা তাহাদের স্মরণে থাকে না; দেহের যে অবর্ণনীয়, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য মনের, আত্মার সহজ, সরল বিকাশের সঙ্গে অপরূপ সার্থকতায় মণ্ডিত হয়, যৌবনের সেই অতুল প্রাণ-সুরভিচর্চ্চিত তনুর ঘ্রাণ-বিষয়ে তাহাদের ইন্দ্রিয়ের চেতনা লুপ্ত হইয়াছে,—নহিলে কৃত্রিম গন্ধের আশ্রয় লইতে চায় কেন? এই সন্দিহান ভাব লইয়া যেন আমরা যৌবনের ফাগ গায়ে মাখিয়া মাতামাতি না করি। কারণ, তাহ'লে মাতামাতিটাই সার হইবে; অবসাদের বিস্বাদে বা উত্তেজনার তিক্ততায় অন্তরের মত একটা শূন্যতার মাঝে আসিয়া পড়িতে হইবে। অন্য যাহাদের কথা বলিতেছি, তাহাদের অভিজ্ঞতার নিকটে মরা সোণার মত যৌবনের মরা দিকটা সহজেই ধরা পড়ে, এবং তাহারা প্রাণের দীর্ঘনিঃশ্বাসটাকে ধীরে চাপিয়া বলে, "আমারাও এককালে ঐরকমই ছিলাম।" এমনি সব ক্ষুদ্র, চাপা নিঃশ্বাসের অন্তস্থলে আমাদের-বয়সী, বিপথ-গামী, লুপ্তযৌবন হৃদয়গুলির যে গভীর বেদনা লুকাইয়া আছে, যে মূক অভিশাপ তাহারা বহন করিতেছে, প্রকৃতির যে ক্রূর পরিহাস তাহারা ব্যক্ত করিতেছে, যাহাদের মনে যথার্থ যৌবনের আগুন জ্বলিয়াছে, তাহারা কি সেই বেদনা, সেই অভিশাপ, সেই পরিহাসের মসীলেখা জ্বালাইয়া ছাই করিয়া সোণার রঙে প্রাণ-কন্দর প্রোজ্জ্বল, দীপ্তিময় করিয়া তুলিবে না; তাহাদের নিঃসঙ্গ মনে যৌবনের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদের অন্তরঙ্গ সঙ্গীরূপে বরণ করিবার আশায় ক্ষণেক পথে থামিয়া যাইবে না? এ যাহারা করিল না, তাদের যৌবনের রঙ শুধু গায়েই লাগিয়াছে, মনে লাগে নাই—কারণ তাহারা অপরের যৌবনের রঙ চিনিল না।

আমাদের কথা

ইচ্ছে ছিল আমাদের ভারি—একটা মাসিক বার করি আমরা জন কয়েক বন্ধু মিলে; তাই ভেবেই ছাপ্‌তে দিয়েছিলাম; ভাদ্রমাসেই কার্য্য আরম্ভ হবে এই-ই ছিল কথা। মত বদ্‌লাল—আশ্বিনে-ই বের হবে। আশ্বিনে বেরুল বটে—তবে মাসিক নয় একখানা complete individual পুস্তিকা। কেন? অত inquisitive নাই বা হ'লেন? মাত্র, বন্ধুর স্মৃতি-নিদর্শনরূপেই কী এ 'অতিথি'কে নিতে পার্ব্বেন না? নমস্কার।

প্রকাশক।



PUBLISHED BY—PRAMATHA NATH MITRA,

AND

Printed by—B. N. Sircar,

AT THE

Ananda Mohan Press,

44, Chaulpati Road, Bhowanipur